আমার স্মৃতিকথা ও বর্তমান স্বাদেশিকতা

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম: একই চিকিৎসা বারবার চলে না)

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসে স্মৃতিচারণ করতে খুব ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে মনের গভীরে পুঞ্জীভূত স্মৃতির সাথে না-পাওয়ার বেদনামিশ্রিত বর্তমানকে মেলাতে। তাই অনেক অবাঞ্ছিত কথামালা। এটাই মনে হয় ইহজীবনের পরিণতি। মনে হয় বলছি এ কারণে যে, এর আগে কখনো জীবনসায়াহ্নে উপনীত হইনি, তাই। 'নতুন নামে ডাকবে মোরে ডাকবে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে, আসবো যাব চিরদিনের সেই আমি' তত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাস, অনন্ত এ জীবনের জীবন ও ঘটনার প্রতিটি মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা চির নতুন, অবিরাম নতুনের আলিঙ্গনে সামনে ধেয়ে চলেছি। ফিরে আসা নিয়মের লঙ্ঘন। কিছু স্মৃতি কখনো বেদনা হয়েও মনের কোনে উদ্ভাসিত হয়, যা হয়তো জনসমক্ষে বলা হয়ে ওঠে না। আবার গতকাল বা পরশু যে নীতিকথা ও যুক্তিতে অনড় ছিলাম, আজো যে সে একই বক্তব্যে অনড় থাকবো, এটা নাও হতে পারে। কারণ সময় ও স্বার্থ পরিবর্তনশীল। জিহ্বার দায়িত্বজ্ঞান কম, সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও মনুষ্যত্যের বিকাশও সমাজ থেকে বিলীয়মান, তাই। এদেশের স্বাধীনতা এসেছিল আমার কিশোর ও উঠতি বয়সের সন্ধিক্ষণে। বাস্তবতার জ্ঞান যতটা না-ছিল, ছিল দুরন্ত-বেয়াড়া একটা মন, আবেগপ্রবণতা। স্বাধীনতার পরে রিলিফ হিসেবে অনেক কিছুই দেওয়া হতো। বণ্টন তালিকায় গ্রাম থেকে আমার ভাগে একবারই একটা বরাদ্দ এলো, ছোট্ট একটা এক ব্যাটারির রেডিও। রেডিওটা ছিল আমার সর্বক্ষণের সাথি। রিলিফ অনেক চুরি হতে দেখেছি, শুনেছিও। মহান নেতাকে মনের কষ্টে বলতে শুনেছি, 'এত কম্বল এলো, আমার কম্বলটা কোথায়!' 'মানুষ পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি।' মহান নেতার অকপট স্বীকারোক্তি তার প্রতি আমার কিশোর মনের ভক্তি বাড়িয়ে দিত। অপরিপক্ক বয়সের কারণে দেশের অবস্থা গভীরভাবে ভাবার অবকাশ তখনও মনে তেমন একটা জন্মায়নি। ভাবতাম, দেশটা কেবল স্বাধীন হলো; আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝি। স্বাধীনতার পর পরই আমাদের অনেক নেতা-কর্মীর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের যে দীনতা শুরু হয়েছিল, মাঝপথে কখনো ঊনিশ-বিশ, কখনো পনেরো-বিশ হয়েছে মাত্র– সে থেকে পতন অদ্যাবধি অব্যাহত আছে এবং তা হালে দিগন্তবিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। তখন আমার আবেগপ্রবণতা ছিল রেডিওর যত গান নিয়ে। ছয় মাসের মধ্যে রেডিওতে যত গান শুনতাম তার শুরুর বাজনাটা শুনলেই গানের কলিটা মুখে বলে দিতে পারতাম, যেমনটি বর্তমানে এদেশে কি হতে চলেছে পত্রিকার সংবাদ পড়ে আগেভাগেই মোটামুটি আঁচ করতে পারি। যাকে বলে, 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়'।

যত গান শুনেছিলাম, প্রায়ই ভুলে গেছি। একটা গানের মাঝের কোনো অংশ এরকম ছিল, '... ও তোর আসা-যাওয়া হলো সার, একদিন ভবে দেখবি রে ঘোর অন্ধকার'। ২০১৪-এর নির্বাচনের আগে জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ অনেককে মধ্যস্ততা করতে অনেকবার এদেশে আসতে হয়েছিল; ফল হয়নি। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনে অনুপস্থিত ছিল। তাতে কি যায় আসে! ভারতের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্বে ও হস্তক্ষেপে নির্বাচন হয়েছিল। ভারত নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বলে সমর্থনও করেছিল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন শেষে আশা দিয়ে বলেছিল 'এটা নিয়ম রক্ষার নির্বাচন'। নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো এ নির্বাচন সাময়িক ভেবে আশায় আশায় দিন গুনছিল। নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে দিনে দিনে পাঁচ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। আঠারো সালের আগে আবারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। বিদেশী প্রতিনিধিদের আবার অনবরত আসা-যাওয়া শুরু হলো। মধ্যস্ততার চেষ্টা। সবই ব্যর্থ হলো। 'কামার যা গড়ে, মনে মনে গড়ে।' গড়া শেষ হলে

বোঝা যায় এটা 'কোন চিজ' হলো। অবশেষে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিরোধী জোট বাদে নির্বাচন আরেকটা হলো। ভারতও বিনা-বিবেচনায় স্বীকৃতি দিলো। পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু হলো 'নিশী রাতের নির্বাচন'। আমরা দেখলাম, 'কেউ কথা রাখেনি', গণরায় উপেক্ষিত হয়েছে। প্রতিবেশী ভারত ক্ষমতাসীন বন্ধুকে স্বীকৃতি দিতে নিরাশ করেনি। এতে যে উভয় পক্ষেরই প্রকাশিত-অপ্রকাশিত স্বার্থ জড়িত।

আমি ঘরছাড়া, দলছাড়া পুরোনো রেডিওওয়ালা। কোনো দলের সাতে-পাঁচে থাকিনে। যদিও দেশের কর্তাব্যক্তিদের এ নীতিছাড়া কর্মকাণ্ড ও গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখানো আমাকে দারুণভাবে আহত করে। আমি বলি, কলিকাল; মৌলভি-মাওলানারা বলেন, আখেরি জামানা; মানুষের মতিগতির সাথে কথার কোনো মিল নেই, নৈতিকতারও দৈন্যদশা। যেনতেনভাবে পকেটে স্বার্থ ভরে ফেলতে পারলেই, স্বার্থটাকে নিজের বলে দাবি করা যায়। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ক্ষমতায় যেতে পারলেই হলো। বিবেকের দংশন? আত্মজিজ্ঞাসা? –সবই ওল্ড মডেলের কথাবার্তা!

আমি দেখি এদেশের নেতা-নেত্রীরা তাদের অশুভ আছর করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে এদেশের জনগোষ্ঠীকে জনআপদে রূপান্তরিত করে চলেছেন; ইচ্ছে করলে জনগোষ্ঠীকে তারা জনসম্পদে পরিণত করতেও পারতেন। আগে নিজে ভালো হতে হতো। দেশের মানুষ রাজনীতিকদের কাছ থেকে সামাজিক সুশিক্ষা দাবি করে। এখন আমড়া গাছ থেকে মিষ্টি আম আসবে কোত্থেকে? আমি তো আমাদের রাজনীতিকদের এই একটা দোষই প্রায় প্রবন্ধেই বারবার দিয়ে আসছি। এদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছি জনগোষ্ঠীকে জনআপদ তৈরি করে। এটাই আমাদের প্রধান ব্যর্থতা। আমাদের 'মহান রাজনীতিকরা' শুধু নগদটাই ভালো বোঝেন। দূরে তাকানোর অভ্যাস এদের নেই বললেই চলে। তাই আজ এই অশুভ পরিণতি। মাঝখান থেকে বায়ান্নটা বছর পেরিয়ে গেছে। এ দুরাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা অনেক কঠিন। তবে বেরিয়ে আশা ছাড়া দেশের উন্নতির বিকল্পও যে নেই। আমাদের অধিকাংশ রাজনীতিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবুজ বাংলার ধূর্ত খেঁকশিয়ালকেও হার মানায়, যে কারণে ভুগছে দেশ। তাই একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, যতদিন দেশ পরিচালকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি না হবে, সামাজিক শিক্ষা না গড়ে উঠবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে, দেশের উন্নতি দুরাশা মাত্র। শুধু নির্দলীয় সরকারের অধীন তিন মাসের জন্য নির্বাচন করলেই দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না, যদিও নির্দলীয় নির্বাচন ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হবার প্রশ্নই আসে না।

নির্বাচন কিন্তু একদিনের বিষয় নয়। পরিবেশ তৈরি হয় কমপক্ষে ছয় মাস আগ থেকে। আবার চব্বিশের নির্বাচন আসছে। আমার সেই রেডিওর গান আবার মনে পড়লো, 'সর্বহারা হইলাম তবু শেষ হইল না আশা, আবার আমি ঘর বান্ধিলাম সে ছিল দুরাশা রে, সে ছিল দুরাশা।' আমি সেই দূরন্ত উঠতি বয়স থেকে দেখে আসছি, এদেশের প্রায় প্রতিটা নেতা, অন্তত যাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে ভরসা করেছিলাম, আমাকে নিরাশ করেছেন। তারা দেশের কথা ভুলে দলীয় নোংরামিতে জড়িয়ে গেছেন। কেবল আমার ঐ রেডিওটা আমাকে কোনোদিন নিরাশ করেনি। বরাবরই ঠিক গানটা শুনিয়ে গেছে।

যে নীতিহীনতার প্রাদুর্ভাব ও সর্বত্র দলীয়করণের মহোৎসব সকল রাজনীতির অভ্যন্তরে ঘটে চলেছে, আমি সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সামাজিক মঞ্চে কাজ করতে গিয়ে দেখছি; সব যায়গা একই রোগে আক্রান্ত– দুর্নীতি, দলবাজি ও দুঃশাসনের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে মানুষের জিহ্বা ঘোরে ফেরে, বিবেকবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসার কোনো বালাই নেই, মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব তলানীতে ঠেকেছে। অথচ আমরা সমাজে চলছি, সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছি। মনুষ্যত্বহীনতার এই রোগের চিকিৎসা রাজনীতিকরা করতে পারেন। অথচ তা না করে আমরা হাজার হাজার বার উন্নয়নের প্রশস্তি গেয়ে চলেছি। বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি নেই। এতে কোটি

কোটি টাকা রসাতলে যাচ্ছে, সবটাই জনগণের টাকা। নীতিহীন জনবল নিয়ে এভাবে কি একটা দেশ চলা উচিত? এই আত্মজিজ্ঞাসার বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। আমরা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখিয়ে দেশকে আজ এ পর্যায়ে এনেছি। মানুষের চরিত্র (সৎ প্রকৃতি) ধ্বংস করে ফেলেছি, আবার সেখান থেকে সুনীতি আশা করছি, দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলবে, দুর্নীতির লেলিহান রসনা সমাজ ও জীবনকে উজাড় ও দুর্বিসহ করে ছাড়বে, আর ভোটের ক্ষেত্রে কেবল সুনীতি আসবে, তা কি হয়? এ তো দেখছি 'বিড়াল বলে খাবো না মাছ, ছোঁবো না আমি কাশিতে যাব' অবস্থা। এভাবেই যদি দেশটা চলতে থাকে, তাহলে কি আমরা পূর্বানুমান করতে পারি, আমাদের জন্য কি অশুভ পরিণতি অপেক্ষা করছে?

আজকের যুগান্তরে (১৫.১০.'২৩) পড়লাম, 'দেশে উন্নয়নের প্রধান বাধা দুর্নীতি: সম্প্রতি এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফরম ৫ হাজার ৭৫ জন যুবককে নিয়ে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করেন। এতে ৬৯.৪ শতাংশ তরুণের মতে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। এছাড়া অন্য বাধাগুলো হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব (৪৬.৫ শতাংশ)।' এখন বিচার্য বিষয়, কি কি কাজ দুর্নীতির আওতায় পড়ে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই-বা কী!

এদেশের আজকের এ অবস্থা তো রাজনীতিকরাই নিজস্বার্থে তৈরি করেছেন। মাত্রা বাড়তে বাড়তে আজ সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে। এদেশের মানুষ যত দুর্নীতিবাজ হবে; পারস্পরিক হিংসা-হানাহানিতে মত্ত থাকবে, যত ধ্বংসের পথে যাবে, ঐ রাজনীতিক ও তাদের 'পরদেশী বন্ধুয়া'দের জন্য তত লাভ; শোষণ করা তত সহজ। এ সমীকরণটা আমাদের মাথায় যত তাড়াতাড়ি ঢুকবে, আমাদের সুশিক্ষার মান তত বাড়বে, উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

'তলে তলে আপস হয়ে গেছে' কথাটা না কি সত্য নয়, বিরোধী গ্রুপ থেকে বলা হচ্ছে। যদিও আমি জানি, সত্য। প্রশ্ন আসে, 'আপস কার সাথে'? যে আমাকে '১৪ ও '১৮-তে ক্ষমতায় থাকতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে, আমার নিত্যকাজের সহচর। ভারত ও চীন উভয়ের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে মাঝখানে পড়েছিল বাংলাদেশ। ভারত পড়েছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও আস্থাহীনতায়। পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থান এক রকমই আছে। চীন একটু ছাড় দেওয়াতে এবং বাংলাদেশ ভারতকে বোঝানোতে, ভারত আবার বন্ধুর পাশে নীরবে অবিচল। সুদূরের অতিথীদের সেই 'আসা-যাওয়া হলো সার', যথার্থ বলে মনে হয়। আমরা পশ্চিমা বিশ্বের সামনে বলছি এক কথা, ক্ষমতায় থাকা স্বার্থ উদ্ধারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বিধায় পিছনে পিছনে চরম সমালোচনা করছি। আবার বলছি, 'আমরা আছি, দিল্লিও আছে। দিল্লি আছে, আমরাও আছি'। একটা চিন্তার বিষয় এখানে আছে। দূরের সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রবক্তারা এবার ভিসা স্যাংশন নিয়ে নেমেছে। পরবর্তীতে যে-কোনো সময় অর্থনৈতিক স্যাংশনও আসতে পারে। এখানেই সমস্যাটা প্রকটের ভয়। তখন কী হবে! ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবো তো! পার্শ্ববর্তী বন্ধুদের তো আমরা চিনি– সবাই 'নেওয়ান সা'ব'। আমি কিন্তু এদেশের রাজনীতিক বলতে ঢালাওভাবে সবাইকে বোঝাচ্ছি না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। সে ব্যতিক্রম দিয়ে দেশের কাজ হবে না।

বয়সের দীর্ঘতায় রিলিফের সে রেড়িও কখন, কোথায়, কিভাবে হারিয়ে গেছে মনে পড়ে না। এখন আশক্ত হয়ে গেছি দৈনিক পত্রিকা নিয়ে। না পড়ে থাকতে পারি না। আবার পড়লেই এদেশের মানুষের, বিশেষ করে রাজনীতিকদের দায়িত্বহীনতা, মিথ্যাবাদিতা, নীতিহীনতা, হালকামি ও উমেদারি কর্মকাণ্ড আমাকে মানসিকভাবে পীড়া দেয়। এ মাস্টারসাহেব তাতে ভীষণ কষ্ট পায়। তাই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পত্রিকায় লিখি। প্রতিজ্ঞা করেছি, রাজনীতিতে দেশাত্ববোধ ফিরে না আসা পর্যন্ত জীবন থাকতে লিখে যাবো। রাজনীতিতে যারা আছেন, তারা আছেন তাদের মনমাতানো হুশহারা তালে। এতেই দেশ ও সমাজের বারোটা বেজে যাচ্ছে। একই

চিকিৎসা বারবার চলে না। অনেকেই যে টোটকা চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তাতে রোগের নিরাময় সুদূর পরাহত। আমি কিন্তু দলকানা হতে চাই না। গত নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম। রসে-যাওয়া জরাজীর্ণ দোতলা বিল্ডিং ভেঙে চুরমার করে নিচে কমপক্ষে পনেরো হাত মাটি খুঁড়ে তুলে দূরে কোথাও ফেলে দিতে হবে। তারপর সেখানে মানসম্পন্ন মালামাল ব্যবহার করে আবার কমপক্ষে পনেরোতলা বিল্ডিং তুলতে হবে। বিল্ডিং কোডে জবাবদিহিতা আনতে হবে। অপারেশনের কাজটা রোগীকে দিয়ে না করানোই ভালো।

(২৫ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।